ভূমিকা

ভূমিকা

(১)

মানব জাতি সমূহের উদ্ভব ও ঠিকানা পদ্ধতি অতি জটিল। তারপর বহুযুগ পার হয়ে সৃষ্ট হয়েছে সমাজ। এই সমাজ এমনই এক পদ্ধতি যার মধ্যে মানুষের শ্রেণিবিভাগ, তার উপবিভাগ, তার কার্যপদ্ধতি, তার কর্তৃত্ব, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার কথার সঙ্গে মানুষের স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয় এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে। এই পরিবর্তনশীল এক জটিল পদ্ধতিই সমাজ নামে অভিহিত। এই সমাজব্যবস্থাতেই শ্রেণিবিভাজন স্বাভাবিক। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে- যে কোনো পুরাতন সমাজব্যবস্থাতেই শ্রেণিবিভাজন অর্থাৎ প্রধান সামাজিক দায়িত্ব হিসেবে বিভাগ লক্ষ করা যায়। ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এর নিদর্শন মেলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঋগ্‌বেদের পুরুষসূত্রে চতুর্বর্ণের কথা থাকলেও সে সূত্রের বক্তব্যের যুক্তির অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন বিনয় সরকার। সেখানে শ্রেণি অথবা জাতির জন্মকথা বা সামাজিক উচ্চ-নীচের কথা কিন্তু মেলে না।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যে জন্মগত পার্থক্য সে যুগে ছিল না তারও সমর্থন আছে পুরাণে। কারণ প্রচেতস দক্ষের কন্যাত্রয়ী কাশ্যপপত্নী দিতি, অদিতি ও দনুর গর্ভে যথাক্রমে দৈত্য, দেবতা ও দানবের জন্ম। মহাত্মা ভৃগু দৈত্য হিরণ্যকশিপুর কন্যা দিব্যাকে এবং দনুর পুত্র পুলোমার কন্যা পৌলমীকে বিবাহ করেন। এই পুলোমার অপর কন্যা দানব-নন্দিনী শচীই দেবরাজ ইন্দ্রপত্নী।

ভাষায় উচ্চবর্ণজাত হলেই যে উচ্চবর্ণই লাভ করা যায় না, তা পুরাণেই লিপিবদ্ধ। তপস্যার বলেই ক্ষত্রিয়েরাও মহর্ষিবাদ লাভ করেছেন। যেমন, বিশ্বামিত্র, মান্ধাতা, সত্য, কপি, পুরুকুৎস, সত্য, অনুহবান, ঋথু, আষ্টিষেণ, অজমীঢ়, কক্ষীব, শিঞ্জয়, রথীতর, রুন্দ, বিষ্ণুবৃদ্ধ প্রমুখেরা ক্ষত্রিয় বংশজাত হলেও তপস্যা বলে ঋষিত্ব লাভ করেছিলেন।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ চারুশিল্পী, কারুশিল্পী এবং অন্যান্য পেশাদার গোষ্ঠীকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে অন্-আর্য, অনার্য শ্রেণিতে ভাগ করেছে এবং তাদেরই শূদ্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

কিন্তু মধ্যযুগে শূদ্রদের অবস্থা মেধাতিথির সময় থেকে উন্নত হয়েছে। এদের সংহিতাগুলিতে তাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে মালো জাতি বিশ্বের দুটি দেশে অবস্থান করে যা হল ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ আবার তাদের সংখ্যার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় ভারতবর্ষে এদের সংখ্যা সর্বাধিক। মালোদের জনসংখ্যা প্রায় ৬৯০০০০ এদের মধ্যে ভারতবর্ষে বসবাস করে ৪৪৩০০০ জন এবং বাংলাদেশে বসবাস করে ২৪৭০০০ জন। ভারতবর্ষে লক্ষ্য করলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই এদের জনসংখ্যা সর্বাধিক প্রায় ৩১৬০০০। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায় যার মধ্যে নদীয়া জেলায় এদের সংখ্যা সর্বাধিক। এই জেলায় প্রায় ৯০০০০ মালো বসবাস করেন। অপর দিকে বাংলাদেশে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঢাকা ডিভিসনে এদের সংখ্যা সর্বাধিক। এখানে প্রায় ১১৩০০০ জন মালো বসবাস করেন।

অতিথি আপ্যায়নে মালো জাতির জুড়ি মেলা ভার। সাবেকী মালো জাতির বসবাস বিভিন্ন নদী জলাশয়, হ্রদ বা সমুদ্রের ধারে, তাই তাদের বৎসরের সবসময়-ই একটা ভয় কাজ করে। বিশেষ করে যে সমস্ত মালো গ্রাম সমুদ্রের ধারে অবস্থিত তাদের শঙ্কা একটু বেশি, নদী বা হ্রদ তীরবর্তী অঞ্চলের মালো সম্প্রদায়ের থেকে।

মালো জাতির প্রধান পেশা হয় মাছ ধরা, মাছই তাদের জীবন ধারণের একমাত্র উৎস, মাছ ছাড়া তাদের জীবন চলে না, তারা সারাদিন ও রাত্রি নিজেদেরকে মাছ ধরার কাজে ব্যস্ত রাখে, এবং দিনের শেষে যে পরিমাণ মাছ তারা ধরতে পারে তাই বিক্রি করে যেটুকু অর্থ উপার্জন হয় তা দিয়ে তাদের সংসার চলে। যদিও এই রোজগার এর পরিমাণ সবসময় সমান হয় না তাই তাদের জীবন শঙ্কায় ভরা তারা সবসময়ই একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে ভোগে, কোনও দিন তাদের জালে মাছ কেমন আসবে, কোনও দিন বেশি আসবে বা কোনও দিন আবার কম এই ভাবে মাছ ধরার পরিমাণের যেমন কোনও নিশ্চয়তা নেই সেই জন্য তাদের সংসারের স্বচ্ছলতাও তেমনি অনিশ্চয়তায় ভরপুর। আবার ঋতু ভেদে তাদের আয়ও কমা বাড়া করে থাকে কারণ বিভিন্ন ঋতুতে নদীতে জলের পরিমাণও ভিন্ন হয় এবং তাদের জালে ধরা মাছের পরিমাণও হয় ভিন্ন। এই আশঙ্কাপূর্ণ জীবন থেকে মুক্তি লাভের জন্য অনেক মালো পরিবার তাদের পেশার পরিবর্তন করে নিয়েছে এবং তারা একটি নির্ভরযোগ্য আয়যুক্ত পেশায় অনেকেই যোগদান করেছেন, কিন্তু এখনও অনেক মালো জাতির লোক

আছে যারা তাদের পূর্বতন পেশার পরিবর্তন করেননি তারা তাদের সাবেকী পেশাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে আছে।

মালোরা অর্থনৈতিক ভাবে একটু পিছনের দিকে অবস্থান করায় তাদের সংসার স্বচ্ছলভাবে চালাতে কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এমত অবস্থায় তারা তাদের ছেলেমেয়েকে অনেক সময় নিজেদের কাজের সহযোগিতার জন্য তাদের পরিবারের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করে থাকেন। তাই বলা চলে মালোদের ছেলেমেয়েদের খুব অল্প বয়স থেকে নিজেদেরকে পরিবারের আয়ের উৎস হিসেবে আত্মনিয়োগ করতে হয়। এই অল্প বয়স থেকে কঠোর শারীরিক পরিশ্রম তাদের গড় আয়ুকে অনেকটাই কমিয়ে দেয়। তাই বলা চলে অল্প বয়স থেকে শারীরিক পরিশ্রম তাদেরকে নিষ্ঠাবান ও শ্রমের প্রতি মর্যাদা দিতে শেখায়। আবার আমরা সামগ্রিক ভাবে মালো ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে একটি ভালো অভ্যাসের কথা পেয়ে থাকি তা হল তাদের নেশা বিমুখতা। প্রায় প্রতিটি অঞ্চলেই আমরা এই অভ্যাসের প্রতিফলন দেখতে পাই। বর্তমান যুগে এই ধরনের আচরণ বিশ্বের দরবারে মালো সমাজের মুখ উজ্জ্বল করে।

(২)

সাহিত্যে মালো জাতির কথা বললে প্রথমেই যার কথা মনে পড়ে তিনি হলেন অদ্বৈত মল্লবর্মণ। তার 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মালো জাতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাছ, মালো, মল্লযুদ্ধ, মল্লবীরদের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন, ধর্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গলে কীভাবে এদের প্রসঙ্গ এসেছে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই গবেষণায়। বাংলা উপন্যাস প্রথমদিকে তার অভিজাত পরিমণ্ডল ছেড়ে কল্লোলযুগ বা তার কিছু পরে মাটিকেন্দ্রিক জীবনধারা, বিশেষত নানা শ্রমজীবী মানুষের জীবনকথাকে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছিল, সেই প্রয়াসেরই পথ ধরে গল্প-উপন্যাসে জায়গা করে নিল বিশেষ বৃত্তিজীবী মানুষজন। মালোদের নিয়ে বাংলায় যে উপন্যাসগুলো লেখা হয়েছে সেগুলি হল- 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), 'গঙ্গা' (১৯৫৭), 'গহিন গাঙ' (১৯৮০), 'মৎস্যগন্ধা' (১৯৮৭), 'মুক্তামাছ' (১৯৯৫), 'ইলিশ জোড়' (১৯৯৭), 'জল ও জালের তরঙ্গ' (২০১৪), 'জাল থেকে জালে' (২০১৫)।

গল্পগুলি হল 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১), 'মিঠেজল : রুপোলী ইলিশ' (১৩৭১), 'শামদ্দি জেলে এবং সমুদ্র' (১৩৭১) 'সৌদামিনী মালো' (২০০৯) 'কালোনৌকা' (১৯৯৭) ইত্যাদি।

মালো মানে যে জাল হাতে শুধু মাছ ধরবে এমন নয় বাংলা সাহিত্যে মালোদের প্রসঙ্গ, জীবনযাত্রা, সংগ্রাম নানাভাবে এসেছে। লিলি হালদারের লেখা 'স্বপ্ন' কবিতাটি তে যেমন মালোদের স্বপ্ন দেখার কথা বলা হয়েছে। তারা ঘর ছেড়ে প্রবাসে গিয়েছে। জগৎ যেমন মহাশূন্যে স্বপ্ন তেমনি তলে ভাসে। পুটি, খলসে প্রভৃতি মাছের কথা পাওয়া যায়। মালোরা জলের শব্দের ডাকে ভেসে চলে একা একা। তারা মৎস্যকন্যা অর্থাৎ মাছের সন্ধান করে। মাছের গন্ধ আজন্মকাল তার গায়ে লেগে থাকে। উৎপল দত্ত 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন। অসামান্য নাট্যকার উৎপল দত্ত, বিপ্লবী উল্লাসকর দত্ত ও সাহিত্যিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ। 'মালো পাড়ার মা' উৎপল দত্তের রচিত আরেকটি নাটক। নাটকটি মালদহ জেলার রতুয়া থানার বিধ্বংসী হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষাপটে রচিত। অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং তার 'তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাস' নিয়ে অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। 'ভাসমান' পত্রিকায় অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও তার উপন্যাস নিয়ে যারা প্রবন্ধ লিখেছেন তারা প্রায় প্রত্যেকেই নিজেরা মালো। ফলে তাদের প্রবন্ধে মালোদের প্রসঙ্গ, জীবনযাত্রা তারা খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বেবী হালদার নিজেও একজন মালো। তার জীবনসংগ্রামের কথা উঠে এসেছে তার লেখা আত্মজীবনী 'আলো আধাঁরি'তে। 'আলো আঁধারি' - র পরবর্তী গ্রন্থ হল- 'ঈষৎ রূপান্তর' (২০০৮) এবং ঘরে ফেরার পথ (২০১৪)।

মানুষের জীবন নানারকম সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সংস্কারের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হয়। সংস্কারাদি মানুষের বাঁচার আগ্রহকে আরো বাড়িয়ে তোলে বা বাঁচতে উদ্ধুদ্ধ করে। জাতি হিসাবে বাঙালি অন্যদের চেয়েও বিশিষ্ট। আমাদের আছে নিজস্ব খাবার, সাহিত্য, সংগীত, পোশাক, এমনকি মাছও। তাই বাঙালিদের যে কোন শুভ কাজে, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মাছ চাই। এর সাথে জড়িয়ে থাকে গৃহস্থ সংসারের কল্যাণ ও মঙ্গলের সংস্কার। মালোদের মধ্যে চড়ক পুজো, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, মনসাপুজো হয় যা বাঙালিদের মধ্যে প্রচলিত। বাংলাদেশে দুর্গাপুজো বা অন্যান্য উৎসব উপলক্ষে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয় যা পশ্চিমবাংলায় সাধারণত দেখা যায় না। মালোদের লোকসংস্কৃতির নানা উপবিভাগ- ধর্মীয় পূজা এবং তৎসংক্রান্ত ব্রত, পৌষপার্বণাদি, বারোমাসি গান, বরজের গান, পালা গানের অংশ, দেহতত্ত্ব, বিচ্ছেদ, কৃষ্ণযাত্রা, নামগান, হরি বংশ, ভাটিয়ালি, প্রবাদ, প্রবচন, ধাঁধা, শ্লোক, ছড়া, লোক সংস্কার, জন্ম মৃত্যু বিবাহের উৎসব, সংস্কার, ধর্মীয় সার্বজনীন দোল

উৎসব, সামাজিক উৎসব নৌকা বাইচ, লোক গল্প ইত্যাদি। গান ছাড়া কোনো অনুষ্ঠান মালোরা ভাবতে পারে না। মালোদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে গান। মাছ ধরার জন্য বেঁউদি জাল, ছান্দি জাল, ঢাঁই জাল, সারেং জাল, কৈলে জাল, হাজালি জাল ইত্যাদি জালের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩)

মালো জাতি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা যাক। মালো জাতি নিয়ে গবেষণামূলক কাজের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সাম্প্রতিককালের হাতে গোনা দু'একটি গবেষণা-মূলক কাজের কথা বাদ দিলে, এই মালো জাতি নিয়ে যারা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছেন, তাদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন মালো জাতি বা সম্প্রদায়ের লোক। মালো সম্প্রদায় বহির্ভূত লেখকের সংখ্যা খুবই কম যারা মালোদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। মালো জাতি সম্পর্কিত একটি প্রবন্ধ ও তিনটি গ্রন্থের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। গ্রন্থগুলি হল-

- মিলনকান্তি বিশ্বাসের 'প্রাবন্ধিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ' (২০১৪)
- সূর্য্যেন্দু দের 'মাছ-জল-মৎস্যজীবী ১ম খণ্ড' (২৫ বৈশাখ, ১৪২৪)
- দিগেন বর্মণের 'মল্ল-গীতিমাল্য' (ডিসেম্বর, ২০১৮)
- কিরীটি ভূষণ মণ্ডলের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মালো জাতির জীবন প্রবাহ' (মার্চ, ২০১৯)

অদ্বৈত মল্লবর্মণের এ পর্যন্ত মোট ছাব্বিশটি প্রবন্ধ আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রবন্ধগুলি অধিকাংশই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোনোরকম আধুনিক যন্ত্র-সামগ্রীর সাহায্য ছাড়াই গ্রাম-বাংলা থেকে লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধগুলির উপকরণ সংগ্রহ করেন। পরবর্তীকালে নবশক্তি, আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। উৎপল মণ্ডল ও রীতা মোদক সম্পাদিত 'বিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধচর্যা' (১৯০১-১৯৪৭) গ্রন্থে বিশ শতকের প্রাবন্ধিকদের ধরা হলেও উনিশ শতকে যেসব প্রাবন্ধিকরা জন্মেছেন যাদের প্রতিভা বিশ শতকে বিকশিত হয়েছে তাদের প্রবন্ধের আলোচনাও এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সমালোচক মিলনকান্তি বিশ্বাস গ্রাম-বাংলায় জন্মগ্রহণ করে বড়ো হয়ে ওঠার সূত্রে নিজস্ব প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে কাছ থেকে দেখেছেন এবং সময়

অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে সেই সব প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতিকে বিলীয়মান হয়ে যেতে দেখেছেন। এর ফলে অদ্বৈতের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে এক আত্মিক নৈকট্য অনুভব করেছেন এবং তাঁর সাহিত্যে লোকসংস্কৃতি বিষয়টি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। অদ্বৈত মল্লবর্মণ বেশ কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন যার অধিকাংশই লোকসংস্কৃতি বিষয়ক। এছাড়াও চিত্রকলা, অভিনয়, জীবনী, ভ্রমণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। উপরিউক্ত প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'প্রাবন্ধিক অদ্বৈত মল্লবর্মণ' প্রবন্ধে তাঁর লোকসংগীত বিষয়ক প্রবন্ধগুলি হল ত্রিপুরার একটি বারোমাসি গান (নবশক্তি, ৩ জানুয়ারি, ১৯৩৬), দুইটি বারোমাসি গান (নবশক্তি, ১০ জানুয়ারি, ১৯৩৬), পল্লীসঙ্গীতে পালাগান (নবশক্তি, ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৬) ইত্যাদি। বারোমাসি গানগুলি পল্লীর নিরক্ষর সমাজের প্রাণস্বরূপ। এই প্রবন্ধগুলিতে বারোমাসি গানের শ্রেণিবিভাগ, ভাটিয়ালি গানের সঙ্গে বারোমাসি গানের তুলনা, বিভিন্ন ধরনের পালাগান প্রভৃতি বিষয়ে প্রাবন্ধিক সুনিপুণভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়া আনুষ্ঠানিক গান হিসেবে 'নাইওরের গান' (নবশক্তি, ৪ নভেম্বর ১৯৩৮) ও 'ভাইফোঁটার গান' (নবশক্তি, ২৮ অক্টোবর, ১৯৩৮) উল্লেখযোগ্য। অদ্বৈতের 'মাঘ মণ্ডল' (নবশক্তি, ১৪ জানুয়ারি, ১৯৩৮) প্রবন্ধে মাঘমণ্ডল ব্রতের ছড়া, কথা, আলপনা ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর অপ্রকাশিত প্রবন্ধ 'পুতুল বিয়ের ছড়া' (নবশক্তি, ২১ অক্টোবর, ১৯৩৮) তে পুতুলের রূপকের মধ্য দিয়ে বালিকাদের খেলার আসর থেকে কীভাবে বিয়ের পিঁড়িতে বসানো হত, সেই ঘটনাকে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বিবিধ প্রবন্ধের মধ্যে পল্লিসম্পদ, এদেশে ভিখারী সম্প্রদায়, পাখির গান ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে।

সূর্য্যেন্দু দের 'মাছ-জল-মৎস্যজীবী ১ম খণ্ড' বইটি তথাকথিত অর্থে মাছ চাষের বা মৎস্যপালনের গতানুগতিক বই নয়। দীর্ঘ অনুশীলন ও গবেষণায় প্রায় অজ্ঞাত একটি সমাজ জীবনের অন্ধকারময় গভীর সঙ্কটের বিবিধ ভাবনা গেঁথেছেন একান্ত ভালোবাসায় নিপুণ তথ্যরাজির সমারোহে ও বিশ্লেষণে। এখানে জলের সমস্যা, মাছের সমস্যা যেমন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বিধৃত, তেমনি মৎস্যজীবী মানুষের জীবনক্রন্দন উঠে এসেছে জীবিকা হারানোর হাহাকারের সমাজ বিশ্লেষণে। সমুদ্রে মাছ ধরার পরিবেশগত সঙ্কট ও অন্তর্দেশীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও গ্রন্থকার উপস্থাপিত করেছেন দীর্ঘ তথ্যের সমারোহে। প্রতিবেশী দেশ- বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে মাছ ধরা প্রতিযোগিতার অসুস্থ রেষারেষি ও অনাবশ্যক-অনভিপ্রেত রাজনৈতিক সঙ্কটও আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে বিষয়ের ও ভাবনার গভীরতায়।

দিগেন বর্মণের 'মল্ল-গীতিমাল্য' গ্রন্থে ধরা পড়েছে মালোদের নানা গান। মালোদের গানে গৌরের প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে, মালোরা কোন কোন দেবদেবীর পুজো করতেন, কোন কোন ব্রত পালন করতেন সেগুলো নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। বাংলার লোকজীবনে 'বারোমাসি' গীত এক সময় ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। এর জন্য মঞ্চ যেমন ব্যবহৃত হত, তেমনি গায়কদের মুখে মুখেও এই সংগীত গীত হত। এই বারোমাসি গানগুলিও তিনি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করেছেন। গানের মতই ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা, মন্ত্র, ব্রতকথা, পরস্তাব, ঝড় হওয়ার জন্য গালি ইত্যাদি। ফলে গ্রন্থটি অভিনবত্বের দাবি রাখে।

কিরীটি ভূষণ মণ্ডলের 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে মালো জাতির জীবন প্রবাহ' গ্রন্থে সামগ্রিক মালো জাতির বৈশিষ্ট্য, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার মালোদের জীবনপ্রবাহ অর্থাৎ সকলের খাদ্যাভাস, মাছ ধরার ক্রিয়া কৌশল, সমাজ পরিচালন ব্যবস্থা, ভাষার প্রয়োগ প্রায় একই রকম। বাংলাদশের খুলনা জেলা, নরাইল জেলার মালোদের জীবনপ্রবাহ, তাদের ব্যবহার্য বিভিন্ন জাল ও জাল তৈরির কৌশল তুলে ধরেছেন। এখানে লেখক ক্ষেত্রসমীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন গ্রামে মালোদের ঘরবাড়ি, তাদের খাওয়া দাওয়া, অতিথিপরায়ণতা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যা এক কথায় অনবদ্য।

'ভাসমান' পত্রিকার (সম্পাদক- সুশান্ত হালদার, খগেন হালদার, দিগেন বর্মণ) – বিভিন্ন সংখ্যায় প্রধানত অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন ও সাহিত্য কর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তার বিখ্যাত উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম' কেন্দ্রিক লেখাই বেশি করে আলোচিত হয়েছে পত্রিকাটির বিভিন্ন সংখ্যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম শতবর্ষে প্রকাশিত 'ভাসমান'-এর সংখ্যাটিতেও বিষয় অদ্বৈত ও তার সাহিত্যের বিভিন্ন দিক। মৎস্যজীবী মালো পরিবারের সন্তান অদ্বৈতের লেখা গ্রন্থটিতে মালো সম্প্রদায়ের জীবন ও সংস্কৃতির বেশ কিছু দিক সূক্ষ্ম ভাবে তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি নিয়ে বা অদ্বৈত মল্লবর্মণ কেন্দ্রিক গবেষণা গ্রন্থের তালিকা নেহাত ছোট নয়।

'Fisheries and Fishermen'- Rup Kumar Barman গ্রন্থটিতে ঔপনিবেশিক বঙ্গের এবং পরবর্তী সময়ের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এবং তাদের জীবিকা সংক্রান্ত আর্থ-সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

কথাসাহিত্যে পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থগুলিতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা থাকলেও মালো সম্প্রদায়ের বর্তমান অবস্থার কথা ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়নি।

এপ্রসঙ্গে গবেষক বাসুদেব সরকারের 'মালদহ জেলার মালো সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা-কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা কাজটি মূলত ছটি অধ্যায়ে বিভক্ত, যথা- ১। গবেষণার উদ্দেশ্য গবেষণার যৌক্তিকতা গবেষণার প্রশ্ন গবেষণার পদ্ধতি গবেষণার সীমাবদ্ধতা গবেষণা সংক্রান্ত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার পর্যালোচনা, ২। মালদহ জেলার পরিচয়, ৩। মালো জাতি-গোষ্ঠীর সমাজ-ইতিহাস, ৪। মালো জাতি-গোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার নানা অনুষঙ্গ, ৫। সংস্কৃতির চাল-চিত্র, ৬। ভাষা। এছাড়া কিছু দুষ্প্রাপ্য তথ্য সংযোজন করেছেন গবেষক।

প্রথম অধ্যায়ে বাসুদেব সরকার গবেষণার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে গবেষণা কর্মটি করেছেন। মূলত ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক, জনগোষ্ঠীগত তথ্যকে প্রধান্য দিয়ে।

বর্তমান গবেষণা কর্মটি মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক। ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে মালো জনজাতি, বিভিন্ন শ্রেণির মৎস্যজীবী সম্প্রদায়, প্রাসঙ্গিক প্রশাসনিক দপ্তরের (মীন ভবন, মৎস্য দপ্তর) মানুষজনের কাছে, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এই জনজাতির (মালো) সামগ্রিক পরিচয় সন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলি রচিত। গবেষণা পদ্ধতি মূলত ক্ষেত্রসমীক্ষা নির্ভর হলেও পাশাপাশি গবেষক বেশ কিছু গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজের সংগ্রহকেও কাজে লাগিয়েছেন। গবেষক গবেষণার জন্য মালদহ জেলার সমস্ত ব্লকে যেতে পারেননি। মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের মানুষের বাড়িতে এবং কর্মস্থলেও (নদ-নদী-জলাশয়ে) গিয়েছেন, এছাড়া বিভিন্ন সমবায় সমিতিতেও গিয়েছেন। মৎস্যজীবীদের সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন। মৎস্যজীবীদের নিয়ে আয়োজিত রাজ্য সম্মেলনেও অংশ নিয়েছেন। গবেষণা সম্পর্কিত নানা গবেষণা পত্র, পত্র-পত্রিকা পর্যালোচনা করা গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ পূর্বে কী ধরনের কাজ হয়েছে এবং গবেষকরা কোন কোন দিকে কী ভাবে আলোকপাত করেছেন সে

বিষয়ে সচেতন হওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাদের অনালোচিত দিকগুলি সম্পর্কে সচেতন হওয়ার চেষ্টা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষক মালদহ জেলার ঐতিহাসিক পরিচয় অর্থাৎ মালদহ জেলা গঠনের ইতিহাস, মালদহের নামকরণ প্রসঙ্গ ইত্যাদি তুলে ধরেছেন। মালদহ নামকরণের উৎস নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বহুদিন থেকেই হয়ে আসছে। পাল রাজবংশের প্রভাব, সেন বংশ, বাংলার ইতিহাসে মধ্যযুগ, মুঘল রাজত্বে মালদহ কেমন ছিল তার কথা জানা যায়। আধুনিক যুগে আর্মেনিয়ান, ডাচ, পোর্তুগীজ, ফরাসী বণিকেরা মধ্য ষোড়শ খ্রিস্টাব্দে মালদহে ব্যবসা বাণিজ্য করত। মালদহ জেলার জন্মলগ্ন থেকে ভৌগোলিক অবস্থান ক্রম পরিবর্তনশীল।এই পরিবর্তনের কারণ প্রধানত দুটি- রাজনৈতিক কারণ, প্রাকৃতিক কারণ। মালদহ জেলার সীমানার কথা গবেষক উল্লেখ করেছেন। গঙ্গা মালদহ জেলার পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তের সীমানা। গঙ্গার অপর তীরে (পশ্চিমে) ঝাড়খণ্ড রাজ্য। উত্তর-পশ্চিমে বিহার রাজ্য, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে উত্তর দিনাজপুর জেলা, পূর্বে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, দক্ষিণ পূর্বে বাংলাদেশ। ভূপ্রকৃতিগত দিক থেকে মালদহ জেলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়- বরিন্দ, টাল, দিয়ারা। মালদহ জেলার জল জলাশয়, নদ-নদী এবং জলাভূমির পরিমাণ বেশি থাকায় ‘লেক ডিস্ট্রিক্ট অব্ বেঙ্গল’ নামে মালদহ পরিচিত ছিল। প্রচুর পরিমাণে খাল-বিল, খানা-খন্দ বাস্তবে এবং নথিতে-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ছোট বড় পুকুর দিঘিও এই জেলায় কম নেই। মহানন্দা, গঙ্গা, কালিন্দী, ফুলহার, ভাগীরথী, তুলসী গঙ্গা, পাগলা, বেহুলা, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, ব্রাহ্মণী, আইসেনি প্রভৃতি নদীর উল্লেখ করেছেন। জলাশয় এক ধরনের আদ্রভূমি। মনুষ্য খনিত, প্রাকৃতিক ভাবে সৃষ্ট জলাভূমিকে ভূপ্রকৃতি অনুসারে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। টাল অঞ্চলের জলভূমি, বরেন্দ্র বা বরিন্দ অঞ্চলের জলাভূমি, দিয়ারা অঞ্চলের জলাভূমির বিবরণ দিয়েছেন এই অধ্যায়ে। মালদহে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিচয় তিনি তুলে ধরেছেন এই অধ্যায়ে। মালদহে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী সম্পর্কিত অন্যান্য তথ্য যেমন ধর্ম, জীবিকা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, মালো জনজাতির পরিচয় ইত্যাদি তুলে ধরেছেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে মালো জাতি-গোষ্ঠীর সমাজ-ইতিহাস, উৎস সম্পর্কিত পৌরাণিক তথ্য, ঐতিহাসিক তথ্য, সমাজ-ইতিহাস, মালো শব্দের উদ্ভব, মালো সম্প্রদায়ের শ্রেণিবিভাগ, আদি বাসভূমি, মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের বর্তমান বসবাস স্থান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন গবেষক।

চতুর্থ অধ্যায়ে মালো জাতি-গোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার নানা অনুষঙ্গ পারিবারিক সূত্রে মালো সম্প্রদায়ের পারিবারিক সম্পর্ক, প্রচলিত রীতিনীতি, গুরুবাদ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন আধিভৌতিক বিশ্বাস, অর্থনৈতিক সূত্রে মহাজনী শোষণ, মহাজনী শোষণের রকমফের, অন্ত্যজ জাতি বলে মালোদের কোণঠাসা জীবন, শিক্ষালাভের সুযোগের অভাব, তাদের বেহিসেবী স্বভাব, নদীর ভাঙাগড়া, জলাশয়ের চরিত্র বদল, মালোদের পেশাগত সমস্যা, পেশা পরিবর্তন, পদবি পরিবর্তনের কিছু কারণ, পোশাক, অলঙ্কার, ঘরবাড়ি, খেলাধূলা, শিশুদের খেলাধূলা, মাছ ধরার প্রাসঙ্গিক উপকরণ, মাছ ধরার অন্যান্য উপকরণ, বিভিন্ন প্রকার জালের নাম ও বর্ণনা, মাছ ধরার সময় নানা বিপদ-আপদের পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়ে সংস্কৃতির চাল-চিত্র, উৎস ও ভিত্তি, মালদহ জেলার সংস্কৃতি, মালো সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস ও পূজা-পার্বণ, তিন নাথের মেলা/আসর, গঙ্গা পূজা, মনসা পূজা, নৌকা পূজা, দুর্গা পূজা, কালীপূজা, অন্যান্য, বিভিন্ন ধরনের ব্রত/পূজা, বিভিন্ন উৎসবের গান, চড়ক পূজা, নীল পূজা, হাজরা পূজা, বিভিন্ন ধরনের কর্মসংগীত, লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার, প্রচলিত লোককথা, ধাঁধা, প্রবাদ প্রবচন, ছড়া, হ্যাঁচকা জাঁক ইত্যাদি এই অধ্যায়ে গবেষক আলোচনা করেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভাষা অর্থাৎ ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যরীতি, শব্দভাণ্ডারের কথা তুলে ধরেছেন।

এরপর গবেষক শেষে পরিশিষ্ট অংশে সাবেক মালো এবং অভিবাসিত মালো এদের বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য তুলে ধরেছেন। এছাড়া মালদহ জেলা এবং মালো সম্প্রদায় সম্পর্কিত আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন করেছেন গবেষক।

(৪)

এবারে আসা যাক গবেষণা পদ্ধতির কথায়। গবেষণা পদ্ধতির জন্য বেশ কিছু অপরিহার্য গ্রন্থের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। সেই গ্রন্থগুলি সংগ্রহের জন্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগার, এবং অনেকের ব্যক্তিগত সংগ্রহের সাহায্য নিয়েছি। এই উদ্দেশ্যে নিজস্ব সংগ্রহও কাজে লাগিয়েছি। এই গবেষণায় মালো সম্প্রদায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ক্ষেত্রসমীক্ষাও করা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। গবেষণায় অগ্রসর হয়ে

ক্ষেত্রসমীক্ষার জন্য প্রশ্ন তৈরি করে নিয়ে তার উত্তর লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে করা হয়েছে।

এরপরে এই গবেষণাকর্মের তথ্যসংগ্রহের কথায় আসা যাক। মালোদের নিয়ে লেখা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, মালোদের নিয়ে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থাবলী নিয়ে বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রিকায় লেখা প্রবন্ধাবলী ও প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। ভাসমান পত্রিকার সংখ্যাগুলি অদ্বৈত মল্লবর্মণ এডুকেশনাল কালচারাল সোসাইটির বর্তমান সভাপতি রণবীর সিংহ বর্মণের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। এছাড়া মালোদের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস সংক্রান্ত বেশ কিছু বইপত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ভাসমান পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ও লেখক দিগেন বর্মণ, সূর্য্যেন্দু দে, রূপকুমার বর্মণ, রণবীর সিংহ বর্মণের কাছ থেকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বেশ কিছু বই সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণাকর্মের জন্য সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য-উপাদানগুলিকে আকর ও সহায়ক উৎসভেদে এবং বিষয়ভেদে সুবিন্যস্ত করে বিশ্লেষণ ও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে মালো সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে বহু তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই মৌখিক তথ্য-উপাদান (oral Data) সংগ্রহের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে, যা ‘পরিশিষ্ট ক’ অংশে সংযোজন করা হয়েছে। মালোদের ব্যবহৃত নৌকা, জাল, ঘরবাড়ি এবং হ্যাচারির চিত্রাদিও ‘পরিশিষ্ট ক’ অংশে সংযুক্ত করা হয়েছে। মাছের উৎপাদন, মৎস্যজীবী সংক্রান্ত নানা রিপোর্ট ‘পরিশিষ্ট খ’ অংশে সংযোজন করা হয়েছে।